অমরত্বের প্রত্যাশা নেই : কবীর সুমন

সোহিনী ঘোষ

কবীর সুমন নামটা মনে এলেই চোখের সামনে একটা চিত্র ভেসে ওঠে। কোনো এক কনসার্টে উদ্বুদ্ধ এক হল ভর্তি শ্রোতা সমস্বরে আওয়াজ তুলছে 'তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই' আর মঞ্চে সেই মানুষ, হাতে তার সম্বল একটি গিটার আর গমগম করছে সেই baritone কণ্ঠস্বর, কানায় কানায় আবেগে ভরপুর। ভাষা ও সুরের প্রয়োগে নিপুণ, একই সাথে গীতিকার- সুরকার -গায়ক কবীর সুমন—একটা প্রজন্মকে মাতিয়ে তুলছেন। ওনার গান একটা করে সম্পূর্ণ Unit যেখানে কথা, সুর, তাল, লয়, ছন্দ ও আবেগ চলে গণতান্ত্রিক ঐক্যতায়, একে অপরের হাত ধরে, কেউ নিজেকে জাহির করতে বা অন্যকে টেক্কা দিতে নয়। কথা ও তার অর্থের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ Saussurean দূরত্ব, সুমনের গানে সুর, তাল, লয় ও ছন্দ কিছু অংশে তার পরিপূরক এবং সেই আবেগগুলোর প্রতিনিধি যা শুধু কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এটি যে কোনো ভালো গানের বৈশিষ্ট্য যা খুব সহজভাবে ধরা দেয় রবীন্দ্রনাথের গানে। শুধুমাত্র এই কারণেই গানের কথা বা লিরিক্স নিয়ে আলাদা করে কথা বললে বাকিদের আধিপত্য খর্ব করা বোঝায়। আর সুমনের কণ্ঠস্বর, শব্দোচ্চারণ ও গায়ন বিহীন তাঁর কথার জাল গান হিসেবে বড়ই অসম্পূর্ণ। ওঁকে কবি হিসেবে সম্ভাষণ করার বিরুদ্ধে অল্প ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি বলেছিলেন তিনি কবি নন এবং কবিতা লেখেন না।

> ... আমি কবিতা লিখিনি, লিখি না, গান লিখতে চেষ্টা করি। বাঙালি জাতির বেশিরভাগ মানুষ সম্ভবত মেনে উঠতে পারেন না যে কোনো কোনো লোক, কী মুশকিল, গান লেখে, সুর করে, গায় এবং কী আপদ বাজনাও বাজায়। ইংরাজি দেশগুলিতে আমার মতো লোকেদের Song writer বলা হয়ে থাকে। আমার ধারণা ছিল আমি একজন গান কারিগর ও সংগীত শিল্পী... । (সুমনের গান)

নিজের ভূমিকা নিয়ে তাঁর কোনো ভ্রান্তি বা বিভ্রম নেই। কখনো নিজেকে 'নাগরিক কবিয়াল' বলে 'গানের ধর্ম পালন' করেছেন, কখনো আবার নিজেকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ছেন

না।— 'কুকুর পাকায় কুন্ডুলি আর/ পাকাই আমি গানের সুতো।' এই গানের সুতো পাকানোও এক শ্রমসাধ্য কাজ—'মাকড়শা তার জাল পেতেছে,/ পাতছি আমি কথার মাদুর'। সুমনের গানকথার মাদুর বৈচিত্র্যে ভরা, বিপুল তাঁর বিচরণক্ষেত্র; ওঁর গানে গানে আধুনিকতার মননে, বিচ্ছুরণে পাওয়া যায় এক নিঃস্বার্থ সাধারণ মানুষকে যাঁর মধ্যে আছে এক দৃঢ় ইচ্ছা,

হাত থেকে হাত, বুক থেকে
বুকে, করে দেব গোপনে পাচার
ভালোবাসার নিষিদ্ধ ইস্তেহার।

আধুনিক বাংলা গানের জগতে, কবীর সুমনের অবদান অপরিমিত। ১৯৯৪-এ তাঁর সংগীতব্যক্তিত্বের প্রথম আত্মপ্রকাশের আগে, 'সংগীতচর্চা' পত্রিকায় মানব মিত্র ছদ্মনামে, তিনি নিজে আধুনিক বাংলা গানের আকালের কথা লিখেছিলেন।

> আধুনিক সাহিত্যের কথা, আধুনিক নাটকের কথা, আধুনিক চিত্রকলার কথা ভাবতে গিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি যে মনের পরিচয় দেয়, আধুনিক সংগীত সম্পর্কে তো বটেই তামাম সংগীত সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সেই মনটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ('আ মরি বাংলা গান বলেই দায় সারব?', ১মে, ২০১৪, আনন্দবাজার পত্রিকা)

আলোচ্য সময় ৯৪-এর আগের দশক যখন আধুনিক গান ঐতিহ্যছুট হয়ে আধুনিক মানুষের চাহিদার ওপর ভর করে সংখ্যায় বাড়ছে। পুনরাবৃত্তিপ্রবণ, ব্যাঞ্জনার তান্ডবে মত্ত কিছু গান রূপোলি পর্দার জন্যই তৈরি হচ্ছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সত্তর দশক-এর বাংলাগানের স্বর্ণযুগ তখন শেষ, সলিল চৌধুরীর পাশ্চাত্য Composition-এর ধারা Saturated । গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ব্যান্ড 'মহীনের ঘোড়াগুলি' ভেঙে গেছে আর কিশোরকুমারের মৃত্যু হয়েছে। এমন সময় সুমন চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব, সুধীর চক্রবর্তী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আকালের মাঝে সেই গৌরব,

> রবীন্দ্রিক বলয় ভেদ করে আমাদের গল্প কবিতা নাটক চিত্রকলা সবই তো সাবালক হল কিন্তু গানের সাবালকত্ব কই? এখনও তো সভাসমিতি- সমাবর্তন- উদ্বোধন- বন-মহোৎসব- জন্মদিন - বিদায় সংবর্ধনায় সেই একমেব রবীন্দ্র গীতি সম্বল। বড়জোর তিন দশক আগেকার গণসংগীতে স্বাদ বদল। আমাদের গান কই, যা আমাদের জীবনযাপনের গায়ে গায়ে লাগে? এই খিন্ন বেদনা, শূন্যতা ও নির্বোধ পরিব্যপ্তির মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান। এক স্পষ্ট ও সংবেদী মেধা যেন ঝলসে উঠল বাংলা গানের অপ্রত্যাশিত প্রান্তরে। (সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য)

সুমন চট্টোপাধ্যায় কে সর্বপ্রথম পাওয়া নাগরিক ব্যান্ডে, অ্যালবাম-এর নাম 'অন্য কথা অন্য গান'। কথা অন্য, তবুও যেন বড় কাছের— সেই ভাষাতে আমরা কথা বলি, সেই কথ্যভাষার অন্যরকম গান যাতে ধরা আছে 'আধুনিক মানসের আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-স্বপ্ন, জীবন-জীবিকা' (সুধীর চক্রবর্তী)

কলকাতা শহরের Pied Piper, কবীর সুমনের জীবনের প্রায় চোদ্দ বছর কেটেছিল বিদেশে broadcast journalist হিসেবে। জার্মানি ও পরে আমেরিকায় থাকাকালীন

তিনি ইউরোপিয়ান, আমেরিকান ও লাতিন ভাষায় Folk ও Protest Music tradition -এর সংস্পর্শে আসেন এবং ভীষণভাবে প্রভাবিত হন Bob dylan, Maya Angelou, Pete Seegar, Paul Simon ও John Lennon এর মতো ব্যক্তিত্বের দ্বারা। সুমনের কিছু গান এঁদের কবিতা ও গানের লিপ্যন্তর। Pete Seegar -এর 'Where Have All the Flowers Gone ? -এর অবলম্বনে বাঁধা সুমনের 'কোথায় গেল তারা' নিছক অনুবাদ নয়। Original গানটার বিখ্যাত Chorus সুমনের গানে তিনি ইচ্ছা করে রাখেন নি। Chorus টা রাখলে সুমনের কথা অনুযায়ী বাংলা গানের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যেত। এই গানটির সাথে নতুন পংক্তি যুক্ত করে সুমন গানটিকে বাঁধেন নতুন এক সুরে যার সাথে Seegar, -এর গানের কোনো মিল নেই। ১৯৯৬ - এ কলকাতার কলামন্দিরের মঞ্চে সুমন ও Seegar, একসাথে হন। দুটো গান পরপর গাওয়া হয় এবং Seegar, তাঁর গানের নতুন ভাবরূপ মেনে নিয়ে সুমনের গানটির প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটি গানের কথা না বললেই নয়— Bob dylan, -এর বিশ্ববিখ্যাত 'Blowing in the wind' —এর অবলম্বনে রচিত 'উত্তর তো জানা'। 'সুমনের গান সুমনের ভাষা' বইটিতে এই গানের কথা বলতে গিয়ে সুমন জানান, ওনার মনে Original গানটির প্রভাব কতটা বিস্তর ছিল,

> শুনেই মনে হয়েছিল—একটা পথের আভাস পাচ্ছি। কিন্তু পথটাকে তো আমার পথ হয়ে উঠতে হবে। '...Blowing in the wind' — গানটাকে বাংলা ভাষায় ধরব কী করে? এ-গানের একটা বাংলা অনুবাদ প্রচলিত ছিল। সেটা আমি শোনার সুযোগ পাই অনেক পরে। বড় আক্ষরিক অনুবাদ মনে হয়েছিল। বাংলা গান হয়ে ওঠেনি।

উপরের উক্তি থেকে ব্যক্ত হচ্ছে গানের অনুবাদকের ত্রিমাত্রিক Challenge । গানটিকে ভিন্ন ভাষায় ধরা, আক্ষরিকভাবে অবিকল প্রতিরূপ না করা ও অনুবাদটির স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভর একটি গান হয়ে ওঠা। সাধারণত কোনো সুপরিচিত প্রখ্যাত গানের অনুবাদ মনে দাগ কাটতে পারে না। মূল গানটা সর্বক্ষণ অনুবাদের মাপকাঠি হয়ে তাকে খর্ব করতে থাকে। ভাষান্তরের দরুণ অনেক সময় গানের কথা নিজ গুণ ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। এই Challenge— গুলো অতিক্রম করতে সুমনের লাগে দীর্ঘ চোদ্দ বছর।

> ১৯৭৩ সাল থেকে চেষ্টা করে গিয়েছি... খসড়ার পর খসড়া করেছি। ছিঁড়ে ফেলেছি। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে। শুধুই মূল গানটির সঙ্গে, বাংলা ভাষার সঙ্গে ধস্তাধস্তি। কী করলে, কোন পদ্ধতিতে ভিনভাষার একটি গান আমার ভাষার গান হয়ে উঠবে, গেয়ে বা শুনে মনে হবে হ্যাঁ, এটা একটা স্বাভাবিক বাংলা গান। গাইতে বা শুনতে গিয়ে অনুবাদজনিত অসমান হোঁচট খেতে হবে না।

১৯৮৭ -এ জার্মানির কোলোন শহরে রাতের ডিউটিতে হঠাৎ সুমনের কথামতো , 'একটা লাইন গজিয়ে ওঠে মাথার ভেতরে' এবং তারপর গানখানা তিনি বেঁধে ফেলেন। অনুদিত গানের Refrain 'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা' Dylan -এর গানের Refrain 'The answer, my friend, is blowing in the wind' —এর ব্যাখ্যা, সরাসরি অনুবাদ নয়। গানটিও কিছু জায়গায় আলাদা,

> ডিলানের গানটা ছিল চার মাত্রার তালে। আমার গানটা বাঁধলাম পাঁচ মাত্রায়। প্রথম স্তবকে ডিলানের সুরটাকে পাঁচ মাত্রার চলনে বসিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তবকে লাগিয়ে দিলাম নিজের সুর।

এই গানটার সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত নেই, কথা ও সুর মিলিয়ে গানটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়। বেশ কিছু এমন অনুবাদের মধ্যে Joan Baiz -এর 'Farewell Angelina' -র অবলম্বনে লেখা 'বিদায় পরিচিতা', Paul Simon -এর 'Sound of Silence' -এর অবলম্বনে লেখা 'স্তব্ধতার গান' ও Largston -এর কবিতার অবলম্বনে লেখা 'আমার মতো কালো' উল্লেখযোগ্য ও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

পাশ্চাত্য সংগীত-এর প্রভাবে সুমনের গানে কথার ছন্দ ও Punctuation ভীষণভাবে প্রাধান্য পায়। সুর বা তালের বাঁধনে কথা বাঁধা পড়ে না। 'ও গানওলা' গানটিকে তালে বাঁধে না, বাঁধে আবেগ নির্ধারিত ছন্দ। কথায় কথায় জমা হতে থাকে nostalgia -র দীর্ঘনিশ্বাস।

এই পাল্টানো সময়ে সে ফিরবে কি
ফিরবে না, জানা নেই
ও গানওলা, আর একটা গান গাও
আমার আর কোথাও যাবার নেই
কিচ্ছু করার নেই

'রেখাবের রূপ' গানটির কথা বলতে গিয়ে একবার উনি বলেছিলেন কিভাবে ওনার গানের খনি শুধুই ওনার স্মৃতি,

> সংগীত ব্যাপারটাই আমার কাছে স্মৃতিনির্ভর। বর্তমানের জমিতে দাঁড়িয়ে আগামীর দিকে আমার সংগীতকে যে বাড়িয়ে দিতে চাই, তার পরতে পরতে জড়ানো রয়েছে স্মৃতি। সংগীত এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। কোন্ অবচেতনের লুকনো স্তর থেকে যে কোন্ সুরের, কোন্ ধ্বনির, কোন্ কথার স্মৃতি উঠে আসে হঠাৎ। সচেতনভাবে তার হদিশ পাই না।

এই অবচেতনের বিন্যাস কখনো রূপধারণ করে বাংলার ঐতিহ্যের, কখনো লোককথার, কখনো ব্যক্তিগত melancholia -র, কখনো সহানুভূতিশীল মানবতার আবার কখনো কোনো সাময়িক ঘটনা নিয়ে আবেগবিহ্বলতার। গানের লিরিকের ঢেউ-এ ভেসে উঠতে থাকে কলকাতার বইমেলা, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, রশিদ খাঁ-এর গান, বিস্মিল্লার পাগলা সানাই, অরুণ মিত্রের কবিতা, ফুলমণি ইসরাত জাহানের মুখ, দীপালি মাহাতোর লাশ, ঘুমাচ্ছন্ন পাপিয়া দে, দত্তপুকুরের পলাশ, পেটকাটি চাঁদিয়াল, ইত্যাদি প্রচুর চেনা-অচেনা মুখ। এই গানকথার মাদুর বোনার ফল স্বরূপ আমরা পাই বাঙালিয়ানার Kaleidoscopic এক টুকরো জীবন, এক একটি গান যেখানে একটি করে নতুন নক্‌শা, যাতে কোনো ভাবনা-চিন্তার পুনরাবৃত্তি বা অপ্রয়োজনীয় শব্দের প্রয়োগ নেই।

১৯৯২ সালের ২৩-শে এপ্রিল বেরোয় সুমন চট্টোপাধ্যায়ের- প্রথম সোলো অ্যালবাম, 'তোমাকে চাই' যার মাধ্যমে বাংলা গানে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। নিমেষের

মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি, তাঁর অতিরঞ্জনের শিকল-বিহীন বাঙালির বাঙালিয়ানার শহুরে কথোপকথনের দরুণ,

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই

গানটা যেন যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থাপনা করছে যুক্তিহীন আবেগের,

এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই
ডাইনে ও বাঁয়ে আমি তোমাকে চাই

ভাবখানা mathematical deduction-এর, ঠিক যেন কিছু প্রমাণ করে conclusion এ পৌঁছনো। গানটা দাবী করে নিচ্ছে শ্রোতাদের 'willing suspension of disbelief' বা ইচ্ছাকৃতভাবে অবিশ্বাসের স্থগিতায়ন যেটা শিল্পের শব্দ-রূপ ধ্বনি সার্থক করছে। এই পুনরাবৃত্তিপ্রবণ 'তোমাকে চাই' পুরো গানটাই তৈরি করেছে একরকম মাদকতা, ইচ্ছার, প্রয়োজনের, ভালোবাসার ও নেশার। আমাদের সামনে ভেসে উঠেছে এক একটি স্তবকে একটি করে কোলাজ -একটা মালায় গাঁথা বিভিন্ন টুকরো টুকরো ছবি, শহুরে জীবনের মতনই খন্ড-বিখন্ড এক অস্তিত্ব।

শীর্ষেন্দুর কোনো নতুন নভেলে
হঠাৎ পড়তে বসা আবোল তাবলে
অবাধ্য কবিতায় ঠুংরি খেয়ালে
স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা দেয়ালে দেয়ালে
সলিল চৌধুরীর ফেলে আসা গানে
চৌরাশিয়ার বাঁশি মুখরিত প্রাণে
ভুলে যাওয়া হিমাংশু দত্তের সুরে
সেই কবেকার অনুরোধের আসরে
তোমাকে চাই।

কথার স্বচ্ছতায় কথার- সংস্কার পেরিয়ে গানটা হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী।

কবীর সুমনের আগে গানকথার ভাষার স্বচ্ছতা বিভিন্ন সংস্কারে আবৃত ছিল। সুমনের হাতে সেই অবগুণ্ঠন অনাবৃত হয়ে গানের ভাষা হয়ে উঠল সাবলীল ও লজ্জামুক্ত। যেমন 'ঠাস্ করে চড় মারল সূর্য আকাশটাকে' গানটায় ঠাস্ করে চড় মারার যে ক্রিয়া, গানের জগতে এমন শব্দ এর আগে ব্যবহৃত হয়নি। জাতিস্মর গানটির দুটো লাইন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ব্যারিকেড করো প্রেমের পদ্যটাই
বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকেই চাই।

কথাগুলো সহজভাবে বলা হলেও সংশয় জাগিয়ে তুলেছে আমাদের মনে। গানে গানে যা অস্বাভাবিক, কানে কানে যা সংশয়-এর সৃষ্টি করছে জীবনক্ষেত্রে কখনো-কোথাও তা স্বাভাবিক। সুমনের ভাষাচেতনা অতীতের বর্জিতকে আগামীতে প্রসারিত করছে। সহজভাবে দ্বিধাহীন প্রেমের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার মধ্যে কথার ছলনা মানায় না। বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার প্রকাশ সঙ্কোচের বিহ্বলতা- বিহীন বলিষ্ঠ ভাষাতেই ব্যক্ত হওয়া উচিৎ এবং তাই হয়েছে। কবি জয় গোস্বামীকে নিবেদন করে লেখা গান 'কবি' শেষ হচ্ছে—'গোঁসাই যে কোন চুলোয় যাবে কেউ জানে না'। প্রায়ই আমরা কাউকে না কাউকে চুলোয় পাঠাই কিন্তু এই লৌকিক চুলোয় যাওয়া আর সুমনের গানকথার চুলোর পার্থক্য আছে। সুমন-এর চুলোর দৌড় সাফল্যের চূড়ো অবধি। কথাটা লৌকিক থেকে হচ্ছে অলৌকিক আর সুমন আমাদের কথার ও শব্দ নিয়োগের সংস্কার ভেঙে তৈরি করছেন এক নতুন ধারা।

ছন্দ যেন অন্যের বউ
বারণ ফুলে ধরছে মউ
এক-চুমুকে চুমুর মতো
আর থামে না।

লাইনগুলো প্রথমবার পড়লে একবারের জন্যও মনে হতে পারেনা যে এগুলো একটা গানের অন্তর্ভুক্ত লাইন। শব্দের হঠকারী প্রয়োগ মনে হতে পারে বেশ কিছু লিরিক্স পড়লে। কিন্তু এই রীতিবিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ সাধারণ মানুষের কথোপকথনের খুব কাছে। উপমাগুলো আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে আমাদের বহু প্রাচীন ধ্যান-ধারণা যা সময়ের সাথে পাল্টায় নি, আধুনিক হয়ে উঠতে পারে নি।

ভিতরে আগুন বাইরে আগুন
গুজরাত হয়ে জ্বলে
বুকের আগুন বাঁচিয়ে রাখাকে
সন্ত্রাসবাদ বলে
শোন ফুলমনি তোমায় ছবিতে
দেখেই নীরবে কাঁদি
আমার কান্না আগুন জ্বালালে
আমি সন্ত্রাসবাদী

উপরের লাইনগুলো সুমনের গান 'ফুলমণি ইসরাত জাহান' থেকে নেওয়া। কবিয়াল গানে গানে যেন আমাদের অতি সহজে সব কিছু মেনে নেওয়ার প্রবণতাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন; 'সন্ত্রাসবাদ' ও 'সন্ত্রাসবাদী'-র উদাহরণের irony -র মাধ্যমে মধ্যবিত্ত

complacency -তে আঘাত হানছেন, আমাদের ভাবতে বাধ্য করছেন সেই উনিশ বছরের মেয়েটির এনকাউন্টারে মরার রহস্য নিয়ে। 'Carbine', 'encounter', 'rifle','AK47'-এর মতন শব্দগুলিকে বড় অনায়াসে গানের লাইনে বেঁধে ফেলেছেন সুমন। প্রায়শই উনি কথার দরুন শ্রোতাদের চমকে দিয়েছেন,

নাচতে চাইছো বুঝি?
ঐ তো বুলেট বাজছে
বেয়নেট তোলে ছন্দ
মণিপরে দেখো নাচছে কেমন
টাটকা লাশের গন্ধ।

লাইনগুলোয় নির্বন্ধিত হচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা ও লোলুপ হিংস্রতা। 'লাশ' শব্দের ব্যবহার-এ একরকম বৈসাদৃশ্য ধরা পড়েছে। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যই যেন গানটার গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলছে। 'মৃতদেহ' বা 'শব' বললে গানটির কাব্যিক গুণের ছন্দ পতন হয়, তাই শ্রোতাবন্ধুদের চেতনায় 'লাশের' ধাক্কা। সুমনের গানের ভাষায় কথার সংস্কারকে উপেক্ষা করার শক্তি আছে; বাঙালির আটপৌরে জীবনযাপন কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার সাহস আছে, সাহস আছে স্রোতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবনাচিন্তা স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরার। সুমনের গান ধর্মনিরপেক্ষ— রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর গানে নেই; আছে বারবার সমকালীন রাজনীতি, নিপীড়ন ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়া। বহুবার বহু আন্দোলনে, সিঙ্গুর থেকে শাহবাগ, সুমনের গান গর্জে উঠেছে। ঠিক যেমন বব ডিলান তাঁর প্রোটেস্ট সং-এর দরুন Beat Generation কে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কবীর সুমনও প্রতিবাদের মুখপাত্র হয়ে নতুন প্রজন্মের Pioneer হয়ে উঠেছেন।

সাবাশ পুলিশ সাবাশ হাজারবার
দুই বছরের বাচ্চাও গ্রেপ্তার

'পেটকাটি চাঁদিয়াল' গানটিতে আমরা পাই এক চিন্তাশীল বাস্তববাদী কথাশিল্পীকে যিনি তুলে ধরেছেন সমকালীন কিছু সমস্যা। 'মাছি ও মরা মুখের' গান-এ এই বাস্তববাদী রিয়েলিজম-এর চরম পর্যায়ে পৌঁছান সুমন,

কেউ খিদে নিয়ে গান লেখে
কেউ খিদে নিয়ে মরে
বমি মাখা তার মরা মুখে
মাছি ভনভন করে

এমন কথাও গান হয়ে উঠেছে। সুর সবটাকে বেঁধে একটা গানে পরিণত করতে পেরেছে।

শব্দের আধুনিকতার প্রভাব সুমন ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সমসাময়িক গায়ক, গীতিকার ও সুরকারদের মাঝে। অনুপ্রাণিত হয়েছে নচিকেতা-শিলাজিৎ-এর জীবনমুখী গান। লোপামুদ্রা মিত্র, অঞ্জন দত্ত, শ্রীকান্ত আচার্যের মতন শিল্পীরাও সুমনের প্রভাব থেকে বঞ্চিত নন। অঞ্জন দত্ত নিজের গানে বারংবার সুমনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন,

তোমার কথা শুনতে ভালোলাগে বন্ধুরা বলে
শোনায় তোমার কথা আমায় প্রায়
তাই শুনলাম তোমার কথা-গান গাওয়ার ছলে
শুনলাম তোমাকে চাই

কবীর সুমনকে নিয়ে লেখা ওনার আরেকটি গানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

অনেক কথা কত কথা কথকতার মাঝে
ভরে গেল ভেতরটা আমার
ইচ্ছা হলো বলতে কথা গানের তালে তালে
আমার ইচ্ছা হলো বাজাতে গীটার, মন আমার

এই গানের তালে তালে কথা বলা, কবীর সুমন এইটাই করে চলেছেন। তিনি কখনও জীবিকা উপার্জনের জন্য গান তৈরি করেননি। তাঁর কাছে গান আত্ম আস্বাদন বা আত্মপ্রকাশের এক ভাবময় মাধ্যম। বিদেশে থেকেও বলে গেছেন কলকাতার কথা,

এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু
পালাতে চাই যতো সে আসে
আমার পিছু পিছু।

অক্লান্তভাবে গানে গানে ফুটে উঠতে থেকেছে 'তিন শতকের শহর'। কখনও তিনি হতে চাননি 'ব্র্যাকেটে বম্বে', চেয়েছেন গান গেয়ে যেতে জীবনের,

সীমানা পেরোতে চাই
জীবনের গান গাই
আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু আনা।

নতুন প্রজন্মের কাঁধে রেখেছেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ হাত, আশাবাদী হয়ে বলতে থেকেছেন,

হাল ছেড়োনা বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে
দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য গানের ভোরে

প্রভাত রায়ের 'সেদিন চৈত্রমাস' (১৯৯৭) চলচ্চিত্রের গানের জন্য সুমন শ্রেষ্ঠ গীতিকার

ও সংগীত পরিচালনার পুরস্কার পান। তারপর সিনেমার গানের জগতে তাঁকে পাওয়া যায় স্বতন্ত্রভাবে ২০১৪-র 'জাতিস্মর'-এ। শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের খেতাব আসে সুমনেরই কাছে। পুরস্কারের হাইলাইট 'জাতিস্মর' আর 'এ তুমি কেমন তুমি' গান দুটি। 'জাতিস্মর' তাঁর পুরনো অ্যালবামের গান যেটি এই সিনেমায় ব্যবহৃত হয় এবং গানটির কম্পোজিশন সম্ভবত সুমনের কেরিয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পোজিশন।

অমরত্বের প্রত্যাশা নেই, নেই কোনো দাবী দাওয়া
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকেই চাওয়া।

আজকের পৃথিবী আশ্চর্য রঙের মোড়কে মোড়া পানপাত্রের মতো। আমাদের সংস্কৃতি, পরম্পরা পরিশীলিত মনন কিংবা রুচিশীল আদর্শ সেই পৃথিবীতে কেবলই পণ্য হয়ে যায়। বিনিময় সম্পর্কের অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে পড়তে আজকের প্রজন্ম যখন শুধুই সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়ে চলেছে, তখন সুমনের বাণীবিন্যাসে আমরা পৌঁছে যাই কাঙ্ক্ষিত পরম্পরায়। এই পরম্পরা আমরা পেয়েছি কবেকার কোন প্রাচীন কবির লেখনীতেই। মঙ্গল কবির দেখানো সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাংলার সংস্কৃতির প্রাণ-ভোমরাটাকে পণ্যপ্রেমী মানুষের সামনে চকিতে এনে দেন সুমন। আমাদের ভাবতে বাধ্য করেন আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি! কয়েক শতাব্দী আগে কবি জীবনানন্দও এমনিভাবেই জারিত করে তুলেছিলেন আমাদের চেতনা। বাংলার লৌকিক অনুষঙ্গগুলি তাঁর হাত ধরেও খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। সুমন যখন বলেন,

কাল কেউটের ফণায় নাচছে লখিন্দরের স্মৃতি
বেহুলা কখনও বিধবা হয়না এটা বাংলার রীতি
বয়ে যায় ভেলা এবেলা ওবেলা একই শবদেহ নিয়ে
আগেও মরেছি আবার মরব প্রেমের দিব্যি নিয়ে

তখন এক বেহুলা হাজারো বেহুলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সত্তায়। আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশের মেয়ে বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছে আজও। তাইতো বিবাহের প্রচলিত দেশাচারে কালরাত্রি ফিরে ফিরে আসে। লৌকিক অমরতায় বিশ্বাস নেই কবির। তিনি জানেন, জীবন নশ্বর। এই পৃথিবীর জল-হাওয়া-আলোর শরীরে মিশে থাকে প্রকৃত শিল্পীর উচ্চারণ। দেশ-কাল-ধর্ম তাই সুমনের গানে কোনো সীমানা বেঁধে দিতে পারেনি।

জীবনের অনেকটা সময় প্রবাসে কাটিয়েছেন বলেই সুমন ষাটোর্ধ্ব বয়সের সীমা পেরোতে পেরোতেও বুঝে নেন শুধু মানুষ নয়, তাঁর যাপন করা জীবন দেশ-কাল-ধর্মের মোহজাল পেরিয়েও এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সমীকৃত হয়ে আছে। সেই বন্ধন হল পরম্পরার বন্ধন, ঐতিহ্যের বন্ধন। তাই বাংলায় গাঙুড়, দক্ষিণ

ভারতের কাবেরী, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি, আফ্রিকার কঙ্গো, জার্মানির রাইন শুধুই অসংখ্য নদীর নাম নয়,—নামান্তরের অভিযাত্রা হয়েও ফিরে ফিরে আসে তাঁর গানে। নাম থেকে নামান্তরের এই অন্তহীন অভিযাত্রাকে একমাত্র সত্য বলে সত্তায় ধারণ করেছিলেন সুমন। তাই বাংলার নদী গাঙুড় দেশ কালের সীমা পেরিয়ে কত অজস্র নদীর স্মৃতি হয়ে মিশে থাকে মানুষের চেতনায়। সুমন জানেন এইসব নদীর প্রবহমান ধারাতেই প্রকৃত শিল্পীর গান বেঁচে থাকবে। তাঁর গানের স্বরলিপি তিনি তাই নিজে রচনা করেন না। প্রত্যয়ী কণ্ঠে নদী ও মানুষের অন্তহীন অভিযাত্রায় আস্থা রেখে গেয়ে ওঠেন,

গাঙুড় হয়েছে কখনও কাবেরী কখনও বা মিসিসিপি
কখনও কঙ্গো, কখনও রাইন নদীদের স্বরলিপি
স্বরলিপি আমি আগেও লিখিনি এখনও লিখিনা তাই
মুখে মুখে ফেরা মানুষের গানে শুধু তোমাকে চাই।

এই দেশহীন-কালহীন অভিযাত্রাকে মানুষের নিশ্চিন্ত আশ্রয়রূপেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন সুমন। তাই বাংলার জল-হাওয়া-আলোর শরীরে আবগাহন সম্পূর্ণ করেও, তিনি অনায়াস গতিতে পৌঁছে যেতে পারেন সীমাহীন আন্তর্জাতিকতায়।

শুধু দেশ বা কালের গন্ডী নয়, ধর্মের গন্ডী থেকেও সুমন মানুষের পরম্পরা-ঐতিহ্য-শিল্পের ক্ষেত্রকে মুক্ত করে দিয়েছেন এই গানে। বিচ্ছিন্নতাবাদী হাজারো পীড়নের সামনে থেকেও তিনি মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই শাশ্বত সত্য। প্রেমহীন জীবনের অন্ধকারে ধর্মও বাঁচতে পারে না। প্রাসঙ্গিক বলেই তথাগত বুদ্ধের জীবনাচরণ স্মরণে এনেছেন। তাঁর করুণায় নিঃষ্কম্প দীপশিখাটি সেদিন জ্বলে উঠেছিল বলেই আজও আমাদের চেতনা এতখানি আলোকিত। তথাগতের সেই নিঃসঙ্গতা -ত্যাগ-তিতিক্ষা-মাধুকরী বৃত্তি কীভাবে যেন আজও ছুঁয়ে থাকে আমাদের। দেশ-কাল-ধর্মের হাজারো বিভেদ পেরিয়েও মানুষ তাই চিরকাল প্রেমের কাঙাল। তাঁর অন্তর-বাহির আকুল করা আর্তি আজও ভেসে বেড়ায় বাতাসে। আর আমরা শুনি সুমন গাইছেন,

তোমাকে চেয়েছি ছিলাম যখন অনেক জন্ম আগে
তথাগত তাঁর নিঃসঙ্গতা দিলেন অন্তরাগে
তারই করুণায় ভিখারিণী তুমি হয়েছিলে একা একা
আমিও কাঙাল হলাম আর এক কাঙালের পেলে দেখা
নতজানু হয়ে ছিলাম তখন এখনও যেমন আছি
মাধুকরী হও নয়নমোহিনী স্বপ্নের কাছাকাছি।

মানুষকে তিনি স্বপ্নের কাছাকাছিই রাখতে চান। সেই জন্যেই সুমনের গান আজকের পণ্যলোভী আধুনিক প্রজন্মকেও 'বিস্মৃত অক্ষরে'র বাঁধনে বেঁধে রাখে।

'গত জন্মের ভুলে যাওয়া স্মৃতি' আশ্চর্য রহস্যময়তায় বারবার ফিরে আসে তাদের কাছে। গানটির কথার ব্যবহার অতীন্দ্রিয়, শব্দবিন্যাস অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের ভাব-চেতনায় প্রবেশ করছে। মিশে যাচ্ছে জীবনের প্রতিটি রূপ রস ও গন্ধ। সুমন হয়ে উঠছেন ঘরের এবং বাইরের, ব্যক্তির এবং সমষ্টির, বিন্দু ও বৃহতের, সবার এবং আমাদের কবীর সুমন। তবে এই ভাষাতেই মিশে আছে আরেক ভাষা, সুরের, সরগম-এর ভাষা। দুই ভাষায় মিলেমিশে গানগুলিকে করে তুলছে একটু দূরের একটু অচিন, একটু রহস্যময়। এই রহস্যই একরকম আকর্ষণ সৃষ্টি করে, গানটাকে নতুন করে দেয়, নতুন করে ফিরে দেখি কথাগুলো-কে। এই সুরই বড় সহজে একত্রিত করেছে ভিন্ন ভাবনা ও ছিন্ন কথাকে। বেঁধে রেখেছে মান্য-অমান্য, কথ্য - অকথ্য, প্রাচীন এবং নবীনের সম্পর্ককে গানের মধ্যদিয়ে। দুচোখের রঙিন কাঁচে মন ঢেকে নিয়েও তাই গেয়ে উঠি আমরা,

মুহূর্ত যায় জন্মের মতো অন্ধ জাতিস্মর

গ্রন্থঋণ :

১. সুমনের গান : সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২
২. সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য : সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪
৩. "আ মরি বাংলা গান বলেই দায় সারব?" : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ মে, ২০১৪
৪. 'কোথায় গেল তারা : কবীর সুমন' (http://youtube.com/watch?v=zmrYVd42ro), 8.09.14